কৃষিই ভিত্তি এবং দুর্বলতা

মৈত্রীশ ঘটক

আনন্দবাজার শতবার্ষিকী ক্রোড়পত্র, ফেব্রুয়ারী ২৩, ২০২২

এখন ভাবলে অবাক লাগে যে, ষাটের দশকের গোড়ায় মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে দেশের সবচেয়ে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলির একটি ছিল পশ্চিমবঙ্গ। তামিলনাড়ু আর পশ্চিমবঙ্গ ছিল তালিকার একদম উপরে, আর তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল নেহাতই উনিশ-বিশ। তার পরে ছিল মহারাষ্ট্র। ষাটের দশক থেকেই সারা দেশের তুলনায় পিছোতে থাকে পশ্চিমবঙ্গ— পনেরোটি বৃহৎ রাজ্যের মধ্যে তার অবস্থান সত্তরের দশকের গোড়ায় দ্বিতীয় থেকে নেমে দাঁড়ায় ষষ্ঠ, তার পরের তিন দশকে তা অষ্টমে গিয়ে ঠেকে, এবং গত এক দশকে তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে দশে।

গত ষাট দশক ধরে রাজ্যের অর্থনৈতিক যাত্রাপথের আর একটি লক্ষণীয় দিক, যা নিয়ে ততটা আলোচনা হয়নি, তা হল রাজ্যের অর্থনীতিতে কৃষির ও শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব। ষাটের দশকে রাজ্যের মোট আয়ে কৃষির ও শিল্পের অনুপাত ছিল ৪০% আর ৩৪%, সারা দেশে তা ছিল ৫৩% ও ২২%, আর পরিষেবার অনুপাত উভয় ক্ষেত্রেই ছিল ২৫ শতাংশের কাছাকাছি। অর্থাৎ, সর্বভারতীয় পরিস্থিতির তুলনায় রাজ্যের আয়ে শিল্পের গুরুত্ব বেশি ছিল, কৃষির গুরুত্ব কম ছিল। সত্তরের দশকেও মোটামুটি একই ছবি। কিন্তু এই সময় থেকেই দেশের তুলনায় রাজ্যে শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমেছে, কৃষির আপেক্ষিক গুরুত্ব বেড়েছে— তাই রাজ্য ও দেশের মধ্যে কৃষি ও শিল্পের অনুপাতের ফারাক একটু কমেছে।

পরের দুই দশকে কিন্তু এই ছবিটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আশির দশক থেকে গোটা দেশের তুলনায় রাজ্যের গড় আয়ে কৃষির গুরুত্ব বেশি এবং শিল্পের গুরুত্ব কম দেখা যাচ্ছে এবং পরবর্তী কালে এই প্রবণতা বেড়েইছে। সাম্প্রতিকতম দুই দশকে রাজ্যে এবং সারা দেশে কৃষির গুরুত্ব আগের তুলনায় খানিক কমেছে, এবং সেই অনুপাতে পরিষেবার গুরুত্ব বেড়েছে। শিল্পের অনুপাতের খুব একটা তারতম্য হয়নি। তা হলেও গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গের আয়ে কৃষির অংশ (২৩%) সারা দেশের তুলনায় (১৮%) বেশ খানিকটা বেশি, শিল্পের অংশ ঠিক সেই অনুপাতেই কম (যথাক্রমে ২৬% ও ৩১%) থেকে গেছে।

রাজ্যের অর্থনীতির এই যাত্রাপথের একটা কারণ অবশ্যই শিল্পে ক্রমে পিছিয়ে পড়া। ষাটের দশক থেকে শুরু করে আর্থিক উদারকরণের নীতি চালু হওয়ার সময় অবধি রাজ্যে শিল্পক্ষেত্রের বৃদ্ধির হার সারা দেশের থেকে লক্ষণীয় ভাবে কম ছিল। উদারকরণের পরের তিন দশকে গোটা দেশে, এবং রাজ্যে শিল্পে বৃদ্ধির হার বাড়ে— কিন্তু দেশের তুলনায় রাজ্যের বৃদ্ধির হার খানিক হলেও কম থেকে যাওয়ায়, তার আগের তিন দশকে হারানো জমি উদ্ধার করা যায়নি।

কিন্তু যে সময় ধরে শিল্পের অবনতি হয়েছে, তার পাশাপাশি কৃষিতে রাজ্যে সারা দেশের তুলনায় আপেক্ষিক সাফল্য না দেখলে ছবিটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশকে রাজ্যে কৃষি উৎপাদনের হার সারা দেশের গড় বৃদ্ধির হারের থেকে বেশি ছিল। আর শুধু উৎপাদন নয়, আমরা যদি উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির হারও দেখি, তা হলে আশি ও নব্বইয়ের দশকে রাজ্যের বৃদ্ধির হার সারা দেশের গড় বৃদ্ধির হারের থেকে বেশি। অথচ আমরা যদি ধানচাষ বা খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতার মানের স্তর দেখি, তা কিন্তু ষাটের দশকের গোড়া থেকে শুরু করে এখন অবধি দেশের গড় উৎপাদনশীলতার মানের থেকে বেশি। দেশের গড়ের থেকে এগিয়ে থেকেও রাজ্যে কৃষির উৎপাদনশীলতার দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি হয়েছে, এটা উল্লেখযোগ্য। যদি উল্টোটা হত, অর্থাৎ পিছিয়ে থাকা অবস্থায় শুরু করে দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি হত, তা হলে বলা যেত যে, নেহাত পিছিয়ে ছিল বলেই এই উন্নতির অবকাশ ছিল।

রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশকে উন্নয়নের প্রমাণ শুধু উৎপাদনশীলতাতেই নয়, অন্যান্য নানা মাপকাঠিতেও ধরা পড়েছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজ্যে দারিদ্রসীমার নীচের জনসংখ্যা দেশের গড়ের তুলনায়

অধিকতর হারে হ্রাস পেয়েছে সত্তরের দশকের গোড়া থেকে নব্বইয়ের দশকের শেষ অবধি। তাই রাজ্যের অর্থনৈতিক যাত্রাপথে শিল্পের ক্ষেত্রে হতাশাজনক রেকর্ডের পাশাপাশি কৃষিতে আপেক্ষিক সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

এর কারণ কী? একটা মত হল, আশি ও নব্বইয়ের দশকের পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উৎপাদনশীলতা যেটুকু বেড়েছে তা মূলত সবুজ বিপ্লবের বিলম্বিত আগমনের ফল (উচ্চফলনশীল বীজ বা সেচের প্রসার), যার মূলে আছে ব্যক্তিগত উদ্যোগ। কিন্তু এই যুক্তির সমস্যা হল, এটি গোটা পূর্বাঞ্চলের, এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশের (যা আবহাওয়া, প্রকৃতি, কৃষিপ্রযুক্তি বা ভূমিব্যবস্থার দিক দিয়ে অনেকটাই এই রাজ্যের সঙ্গে তুলনীয়) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, ধান চাষে উচ্চফলনশীল বীজের প্রসার পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে তুলনীয় হারেই হয়েছিল। অথচ পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার বাকি সারা ভারত এবং বাংলাদেশের থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কৃষি পরিসংখ্যান নিয়ে কিছু বিতর্কিত পদক্ষেপের ফলে পরিসংখ্যানগত অতিরঞ্জনেরও কৃষির বৃদ্ধির হারকে এমন বেশি দেখাতে পারে, কোনও কোনও সমালোচক এ কথাও বলেছেন। ভিন্নতর পরিসংখ্যান ব্যবহার করে আমরা হিসাব করে দেখছি যে, ১৯৭৭-এর পর থেকে আশির দশক এবং নব্বইয়ের দশকে পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির হার তার আগের ও পরের পর্যায়ের তুলনায় বেশি। শুধু তা-ই নয়, তা একই সময়সীমার মধ্যে সারা ভারতের, ও বাংলাদেশের বৃদ্ধির হারের তুলনাতেও বেশি।

আর একটি সম্ভাব্য কারণ হল বামফ্রন্ট সরকারের কৃষিনীতি। ১৯৭০-এর শেষভাগ থেকে শুরু করে ১৯৮০-র দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ভাগচাষের ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার করে, যা 'অপারেশন বর্গা' নামে পরিচিত। এই সংস্কারে ভাগচাষিদের ফসলের ভাগের পরিমাণ বাড়ানো হয় এবং উচ্ছেদের ভয় থেকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়। এ ছাড়া উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন করা হয় এবং তার সঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তোলা, আর সার, বীজ, ও চাষের অন্য উপাদানের সার্বিক বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি। ২০০২ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, পল গার্টলার আর আমি দেখাই যে, রাজ্যে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সীমিত ভূমিসংস্কারের সদর্থক ভূমিকা ছিল। তা হলেও আমাদের গবেষণা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, এর প্রভাব সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ২৮% ব্যাখ্যা করতে পারে; বাকিটার জন্যে দায়ী অন্যান্য নানা উপাদান। এই অন্য উপাদানগুলি কী, এবং তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে পরবর্তী কালে গবেষণা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রণব বর্ধন এবং দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা। তাঁরা দেখাচ্ছেন যে, রাজ্য সরকারের মিনিকিট বিতরণ প্রকল্প কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এখন একটা প্রশ্ন হল, অপারেশন বর্গা বা সীমিত ভূমিসংস্কারের কৃষির উপর সদর্থক প্রভাব থেকে যদি থাকেও, তার কারণ কী? ভাগচাষি ফসলের যত বেশি ভাগ পাবেন, এবং জমি থেকে তাঁর উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা যত কমবে, ততই তিনি বেশি উদ্যমের সঙ্গে চাষ করবেন। সম্প্রতি একটি 'র‍্যান্ডমাইজ়ড কন্ট্রোলড ট্রায়াল' বা আরসিটি-তে দেখা হয়েছিল, ভাগচাষের ক্ষেত্রে চাষির ভাগে শস্যের অনুপাত বাড়ালে তার প্রভাব উৎপাদন বৃদ্ধির হারে কী প্রভাব পড়ে। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শস্য ভাগের পরিমাণের অনুপাত বাড়ালে উৎপাদন বৃদ্ধির হার যথেষ্ট বাড়ছে, যা অনুপ্রেরক হিসেবে ফসলের ভাগের গুরুত্বের দিকে ইঙ্গিত করে। এই গবেষণাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর যে প্রভাব পাওয়া যাচ্ছে তা 'আরসিটি'-পূর্ব জমানায় করা আমাদের গবেষণার ফলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

তবে মনে রাখতে হবে যে, অপারেশন বর্গা কোনও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়নি, তাকে গ্রামবাংলায় পট-পরিবর্তনের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নানা উপাদানের বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতিই হোক, তার আগের পর্যায়ের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসানই হোক, বা গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার পাল্লা দরিদ্রদের দিকে ঝোঁকার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে শ্রম, পুঁজি এবং জমির বাজারে কিছু গুণগত পরিবর্তনের ফলই হোক, এগুলো অপারেশন বর্গা ও সীমিত ভূমিবণ্টনের পরিপূরক উপাদান এবং এদের সমন্বিত প্রভাব কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক ছিল।

কৃষিতে রাজ্যের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সমস্যা হল, উন্নয়নের ধ্রুপদী তত্ত্ব বলে যে, বিভিন্ন দেশে, অঞ্চলে ও কালে সময়ের সঙ্গে কৃষির গুরুত্ব কমে, শিল্পের গুরুত্ব বাড়ে, এবং পরিষেবার গুরুত্ব আরও বাড়তে থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধু কোনও একটি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির মাধ্যমেই শুধু হয় না, তার জন্যে প্রয়োজন মূল যে অর্থনৈতিক উপাদানগুলি— অর্থাৎ শ্রম, পুঁজি, এবং ভূমি— সেগুলো নতুন ধরনের প্রয়োজন মেটাতে নতুন ভাবে বিন্যস্ত হয়, অধিক থেকে অধিকতর মূল্যের উৎপাদনে নিয়োগ করার নিরন্তর

প্রক্রিয়ায়, যার গতি সচরাচর কৃষি থেকে শিল্প এবং পরিষেবার দিকে। এ ভাবেই শহরাঞ্চলের প্রসার হয়ে থাকে। বর্তমান দুনিয়ার ধনী দেশগুলো ঐতিহাসিক ভাবে এই সব পর্ব উতরে তবেই আজকের জায়গায় এসে পৌঁছেছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে রাজ্যের অর্থনৈতিক যাত্রাপথ অবশ্যই খানিক বিপরীতমুখী। সাম্প্রতিক কালেও— যেমন, গত এক দশকে— দেশের তুলনায় রাজ্যে কৃষিতে বৃদ্ধির হার দেশের গড়ের থেকে বেশি থেকেছে, সার্বিক বৃদ্ধির হার কম হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু আয় এবং কর্মসংস্থানের দিক থেকে দেখলে শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার না বাড়লে সার্বিক বিচারে রাজ্যের অর্থনৈতিক পশ্চাদপসরণ অব্যাহত থাকবে।

রাজ্যের অর্থনীতির সার্বিক অগ্রগতির পথে অনেক অন্তরায়। তবে, এর একটা বড় কাঠামোগত কারণ হল শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে জমির সমস্যা। বামফ্রন্টের সীমিত ভূমিসংস্কার শুরু হওয়ার তিন দশক পরে সিঙ্গুরে রাজ্যে শিল্পায়নের পথে মূল প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়াল জমি-অধিগ্রহণের সমস্যা।

সমস্যাটা সারা দেশের জন্যে প্রযোজ্য হলেও জনসংখ্যার তুলনায় ভূমির অপ্রতুলতা এবং জনসংখ্যার চাপের ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভূমির ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাজিত হওয়ার প্রবণতা রাজ্যের ক্ষেত্রে আরও প্রকট। তার উপর সীমিত ভূমিসংস্কারের ফলে ভূমিহীন কৃষকদের হাতে জমি আসা এবং বর্গা আইনের কারণে অনেক ক্ষেত্রে জমির মালিকদের ভাগচাষিদের কাছে জমি বেচে দেওয়ার কারণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। সাম্প্রতিক কৃষি সেনসাস থেকে জানা যাচ্ছে যে, রাজ্যের কৃষিতে নিয়োজিত জমির গড় পরিমাপ সত্তরের দশকের গোড়ার তুলনায় ২০১৫-১৬ সালে কমেছে প্রায় ৪০%, এবং দেশের বর্তমান গড়ের সঙ্গে তুলনা করলে তা রাজ্যের তুলনায় দেড় গুণ বেশি। একই সঙ্গে কৃষিতে নিযুক্ত জমিতে প্রান্তিক চাষিদের (যাদের জমির আয়তন এক হেক্টর বা তার কম) অনুপাত সত্তরের দশকের গোড়ায় ছিল ৬০%, যা ২০১৫-১৬ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩%— বর্তমানে প্রান্তিক চাষিদের সর্বভারতীয় অনুপাত ৬৮%।

এখন জমি যত বিভাজিত হবে, সংশ্লিষ্ট জমির মালিকদের এক সঙ্গে জমি বিক্রি করতে রাজি করানো ততই কঠিন হবে। আর একটা সমস্যা হল জমির বাজার ঠিক আর পাঁচটা বাজারের মতো নয় যে, দাম বাড়লে জোগান বাড়বে এই সরল যুক্তিটা খাটে। জমি শুধু রোজগারের উৎস নয়, জমির মালিকানা একটা বড় ধরনের আর্থিক নিরাপত্তাও দেয়। ক্ষুদ্র জমির মালিকদের কাছে এই দ্বিতীয় কারণটি বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তাই জমির দাম বাড়লে তাঁরা বরং বেশি করে জমি আঁকড়ে থাকতে পারেন, তাই বাড়ার বদলে জমির জোগান কমেও যেতে পারে। ধনী চাষির হাতে উদ্বৃত্ত জমি আছে, তাই দাম বাড়লে তাঁদের কাছে থেকে জমির জোগান বাড়বে, কিন্তু সার্বিক জোগান নির্ভর করবে জমির বণ্টনের উপর। রাজ্যের সীমিত ভূমিসংস্কার এবং জমিতে জনসংখ্যার চাপ, এই দুই কারণের ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা বেশি, তাই দাম বাড়লে জোগান না বাড়ার সম্ভাবনা বেশি। আমাদের সমীক্ষা থেকে দেখছি, যে পরিবারের হাতে জমির পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে কম, এবং যাঁদের কৃষির উপর নির্ভরশীলতা যত বেশি, তাঁরা জমি বেচতে ততই অনিচ্ছুক। এখানে রাজ্যের অর্থনীতিতে একটা বিষচক্র কাজ করেছে— শিল্প হচ্ছে না বলে বিকল্প কম, আবার বিকল্প কম বলে জমির উপর নির্ভরতা প্রবল, আর তাই শিল্প হচ্ছে না।

‘কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ’ স্লোগানটি রাজ্যে কার্যকর হতে পারেনি। বরং এটাকে পাল্টে বলা যেতে পারে কৃষি একই সঙ্গে রাজ্য অর্থনীতির শক্তি এবং দুর্বলতা। আর এর একটি প্রধান কারণ হল, জমি নিয়ে জটিলতা। অদৃষ্টের পরিহাস হল যে, আগের জমানায় সীমিত ভূমিসংস্কারের সাফল্য এই প্রবণতাকে আরও প্রকট করে দিয়েছে।